আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ২০২৫

আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয় (Our daily essentials)

SKS

বিশেষ ক্রোড়পত্র

এসকেএস ফাউন্ডেশন

মানবিক সমাজ গঠনই লক্ষ্য

আজ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়" (Our daily essentials), যার লক্ষ্য মানবাধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরা। প্রতিপাদ্যটি মানবাধিকার কীভাবে দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা বোঝানোর উপর জোর দিয়েছে।

জাতিসংঘের নির্দেশনায় বিশ্বের সকল দেশে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের এই দিনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। পরে ১৯৫০ সালের ১০ ডিসেম্বর দিনটিকে জাতিসংঘ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও, 'সর্বজনীন মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাকে' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০ ডিসেম্বরকে নির্ধারণ করা হয়। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নবরূপে সৃষ্ট জাতিসংঘের অন্যতম বৃহৎ অর্জন।

মানুষের মৌলিক অধিকার ও চাহিদা নিশ্চিতের পাশাপাশি, সকলের নিরাপত্তা বিধান, স্বাধীনতা ও মর্যাদা সমুন্নত রাখাই মানবাধিকার। মানবাধিকার একটি বিশদ ও সামগ্রিক বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির যুগেও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় প্রতিনিয়ত আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হচ্ছে। মানবাধিকার বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সমস্যা যেমন - যৌন হয়রানি, পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে এসকেএস নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া বিয়ে, সন্তান লাভ, পরিবার গঠন, নিজের মতো চাওয়া পাওয়া পূরণ, মুক্তচিন্তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, জনসমাবেশ ও সমাবেশে অংশগ্রহণ, গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, শ্রমিকদের কাজের অধিকার, খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান, সবার খেলাধুলার অধিকার নিশ্চিতকরণ, নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ, ন্যায়বিচার নিশ্চিত, গোত্রের মধ্যে সমতা রক্ষা, যার যার ধর্ম তার তার পালনের অধিকার, ছুটি কাটানোর অধিকার, শিশু শ্রম বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে ভূমিকা রেখে চলেছে এসকেএস ফাউন্ডেশন।

এসকেএস ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে। এসকেএস সমাজে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে। বিশেষকরে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা করতে এসকেএস ফাউন্ডেশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসকে কেন্দ্র করে আজ দেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সাথে সাথে এসকেএস ফাউন্ডেশন মানববন্ধন, আলোচনা সভাসহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে। মানবাধিকার সম্পর্কে সকলের সম্যক ধারণালাভ এবং তা চর্চার মধ্যমে একটি মানবিক সমাজ গঠনে ভূমিকা রেখে যাবে এসকেএস ফাউন্ডেশন।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান

নাগরিক অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা

আশরাফুল আলম

সমাজে বিবিধ শ্রেণির মানুষের বসবাস। অবস্থা ও অবস্থানভেদে মানুষের সক্ষমতা এক নয়। দেশের নাগরিকরা সর্বত্র নানা সমস্যায় ভুগছে। অনেক সম্প্রদায় সামাজিক বৈষম্যের শিকার। নাগরিকরা ন্যায্যতা, নাগরিক অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। আবার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দুর্যোগের শিকার হয়ে অনেক মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে। দুরারোগ্য ব্যাধি, দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, মহামারি তো আছেই। তাই সেবামূলক উদ্যোগ ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিশ্বায়নের যুগে দেশের মানুষ প্রতিনিয়ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটে পতিত হচ্ছে। সংকট মোকাবিলায় সরকারকে চাহিদানুযায়ী কার্যকর উদ্যোগ নিতে হয়।

দেশে নাগরিক অধিকার, মানবাধিকার নিশ্চিত করে দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। নাগরিকের অধিকার বিষয়ে মানবাধিকারের ঘোষণা পত্রের ২২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়। এমন প্রত্যয়ে প্রায় ৫০ বছর পূর্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলনের দলিল হলো ১৯৭২ এর সংবিধান। ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই অনুচ্ছেদে বেকারত্ব, দুরারোগ্যব্যাধি, পঙ্গুত্বজনিত (প্রতিবন্ধী) কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতাহীনতা এতিম বা বার্ধক্যজনিত কারণে অথবা অনুরূপ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার নিশ্চিত করতে সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিষয়াদিকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের শর্ত পূরণে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে অসহায় দুঃস্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা নিশ্চিত করতে কাজও করছে।

আমরা নাগরিক হিসেবে যে যার অবস্থান থেকে সবাইকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখি। 'কাউকে পিছনে ফেলে নয়' এই নীতির নিরিখেই গ্রামীণ দরিদ্র অসহায় দুঃস্থ নারী পুরুষের শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করে আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়া আবশ্যক। সরকারের নানামূখী ভালো কাজের মধ্যে সামান্য কিছু অসৎ মানুষের লোভ লালসার শিকার হয়ে অসহায় দরিদ্র, দুঃস্থ মানুষ দিনের পর দিন বঞ্চিত হচ্ছে। উন্নয়নের ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও এখনও একটু ভালো খাবারের সন্ধানে অতি দরিদ্র মানুষ ধনীদের নিকট হাত পাতে। এখনও অনেক মানুষ যেকোন ধরনের নিরাপত্তা ভাতা প্রাপ্তির বাইরে রয়েছে। তবে সম্প্রতি সমাজসেবা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই অনগ্রসর পিছিয়ে থাকা মানুষগুলিকে চিহ্নিত করে সরকারি বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এই নিরাপত্তা কর্মসূচিকে ১০০ ভাগে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; ইতিমধ্যে কিছু কাজ শুরুও হয়েছে।

এসডিজি'র অভীষ্ট অর্জনে দারিদ্রকে নির্মূল করতে হলে সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকলকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং সেই বাস্তবায়নের সঠিক অগ্রগতির নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি। যদি সেটা করা সম্ভব না হয়, তবে এসডিজি'র অভীষ্ট অর্জনে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই সকল ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুনিশ্চিত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকল স্তরে প্রয়োজন জনসম্পৃক্ততা। আশার কথা হলো, সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন ছাড়াও আরও প্রায় ২৫ মন্ত্রনালয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে। এই অবস্থা থেকে অনুমেয় যে, দেশের দারিদ্র্য নিরসনে এবং এসডিজি অভীষ্ট অর্জনে সম্মিলিত উদ্যোগের কোন কমতি নেই। যার ফলে কোন কোন ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে উপকারভোগীর সংখ্যা ২ থেকে ৪ গুণ এবং বরাদ্দের পরিমান ১০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি'র অভীষ্ট অর্জনে রাষ্ট্রের ঝুঁকিপূর্ণ, অনগ্রসর, অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা, জীবনমান উন্নয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকারের গৃহিত সমাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে দরিদ্র মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে মাতৃত্বকালীন ভাতা, বয়স্ক নারী-পুরুষের সুরক্ষায় বয়স্ক ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা, দরিদ্র ও অসহায় নিয়মিত শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত দুঃস্থ নারীদের জন্য ভাতা, তৃতীয়লিঙ্গ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বয়স্ক ও শিক্ষা উপবৃত্তিমূলক ভাতা, শিশুর নিরাপত্তার জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, দরিদ্র নারীর উন্নয়নে ভিজিডি, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ও টিআরসহ বিভিন্ন কর্মসূচি।

এই সকল ভাতার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ও সরকারকে আরও গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। যেমন- প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা প্রদান, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোক ও থ্যালাসেমিয়াসহ বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান। সরকারি এবং বেসরকারিভাবে নানামুখী কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির চলমান পথ ধরে রাখা জরুরি। সেজন্য সেবা প্রদানকারিকে সেবকের ভূমিকা নিয়ে দায়িত্ব পালন আবশ্যক। সকল ধরনের অনিয়ম ও লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই এসডিজি'র অভীষ্ট অর্জন সম্ভব বলে ধরে নেওয়া যায়। একইসাথে দেশ স্থান করে নিতে পারে কল্যাণ রাষ্ট্রের তালিকায়।

লেখকঃ উন্নয়ন কর্মী।

মানবাধিকার বাস্তবায়নে এসকেএস

মোঃ জালাল উদ্দিন

মানবাধিকারের ইতিহাস মূলত দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত। প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের বিবর্তন, যা ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের চূড়ান্ত রূপ নেয়। মানবাধিকারের বিবর্তনে ম্যাগনাকার্টা (১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন এবং ব্যারনদের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিপত্রটি "মানবাধিকারের মহাসনদ") হিসেবে পরিচিত। মানবাধিকার হলো সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত নৈতিক নীতি বা নিয়ম বা মানব আচরণের মান প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রায়শই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় আইন দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। এই অধিকারগুলিকে সহজাত বা অবিচ্ছেদ্য বলে মনে হয়; যার অর্থ জাতীয়তা, ধর্ম, গোষ্ঠী বা আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মতো বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে কেবল মানুষ হওয়ার কারণেই এগুলি প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত। এগুলো নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের বিস্তৃত পরিসরকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন- জীবনের অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, দাসত্বের বিরুদ্ধে সুরক্ষা এবং শিক্ষার অধিকার।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা ১৯৪৮ সাল থেকেই বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের প্রচার ও সুরক্ষার লক্ষ্যে অসংখ্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ও জাতীয় আইনকে অনুপ্রাণিত করেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আইনী কাঠামোতে মানবাধিকার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে; যা জাতিসংঘ, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের মান পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োগের জন্য নিবেদিত জাতীয় সংস্থাগুলির মতো প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমর্থিত। মানবাধিকার হলো প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা। এটি ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য অপরিহার্য। মানবাধিকার লঙ্ঘন বিভিন্ন ক্ষেত্রে মারাত্মক বৈষম্য, নিপীড়ন, সহিংসতা বৃদ্ধি করছে। বাংলাদেশে মানবাধিকারের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য ২০১১ সালে একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয় এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা মানবাধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত; যা বাক্স্বাধীনতা, সমাবেশ, স্বাধীন মতামত প্রকাশ এবং সমতার মতো মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে রাষ্ট্র, সরকার, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আর এর উপকারভোগী জনগণ ও সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও কর্মকর্তগণ। মানবাধিকার কিভাবে দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ তা প্রমাণের লক্ষ্যে ২০২৫ সালের মানবাধিকার বিষয় "মানবাধিকার আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় বিষয়"। আইন প্রয়োগে বৈষম্য, মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব, বিনা কারণে গ্রেফতার বা আটক, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, এ সকল ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়। দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা অধিকাংশ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে প্রচলিত আইনেরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

বাংলাদেশের মানবাধিকার প্রাথমিকভাবে দেশের সংবিধান ও সংবিধানের বিভিন্ন ধারা/উপধারা দ্বারা সংরক্ষণ/নিশ্চিত করা হয়েছে যা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের পাশাপাশি জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য, বাক্স্বাধীনতা এবং ধর্মের মতো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে এবং রাষ্ট্র তার সুরক্ষার জন্য দায়বদ্ধ। সংবিধানের মূল আইনগুলি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয় এবং মানবাধিকার রক্ষায় যথাযথ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১১, ২৭, ২৮, ৩২, ৩৩,৩৪, ৩৯ এবং ৪১ ধারার মাধ্যমে মানবাধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। উপরোক্ত ধারাগুলি দ্বারা জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমতা ও বৈষম্যহীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা এবং শিশুশ্রম সংরক্ষণ করা হয়েছে। মাবাধিকার রক্ষায় যেমন রাষ্ট্র ও সরকারের দায়বদ্ধতা আছে, তেমনি সরকারি অন্যান্য সংস্থা, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেরও দায় আছে।

এসকেএস ফাউন্ডেশন ১৯৮৭ সাল থেকে গাইবান্ধার দারিদ্রপীড়িত ও দুর্যোগপ্রবণ অনগ্রসর কমিউনিটিতে কাজ করে আসছে। অবশ্য সংস্থাটির কার্যক্রম বর্তমানে গাইবান্ধাসহ বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ২৯টি জেলায় বিস্তৃত। এসকেএস একটি বে-সরকারি সংস্থা হিসেবে এর কর্মী, কর্মকর্তা ও কর্মসূচি অংশগ্রহণকারীদের সুরক্ষা, শিশু সুরক্ষা, জেন্ডার, কোড অব কন্ডাক্ট, সংস্থার কোর ভ্যালু, তথ্য প্রকাশ ও মানব সম্পদ পলিসির মাধ্যমে মানবাধিকারের সুরক্ষা প্রদান করেছে।

বাংলাদেশের সৃষ্টি থেকেই সামাজিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা নারীদের কর্মক্ষেত্র ও অর্থনীতির মূল ধারায় অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে আসছে। ফলে নারীরা দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির মূল ধারায় অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত হচ্ছে এবং কর্মক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়ছে। নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে এহেন বাধা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এসকেএস ফাউন্ডেশন এর মানব সম্পদ নীতিমালায় নারীদের কর্মক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার ও কর্মক্ষেত্রে সুবিধাজনক পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীদের নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, শিশুর যত্ন, পদোন্নতি ও নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও এর চর্চা অব্যাহত রেখেছে।

এসকেএস ফাউন্ডেশন এর সুরক্ষা নীতিমালা দ্বারা শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ ও সংস্থার কর্মী-কর্মকর্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত, অবমাননা ও অবহেলার হাত থেকে রক্ষা করছে। শোষণ ও বৈষম্যের মাধ্যমে মানবাধিকার লংঘিত হয়। শোষণের সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণগুলি অন্বেষণ করা এবং পদ্বতিগত প্রতিরোধ নিশ্চিত করার জন্য এসকেএস তার প্রতিটি বিভাগে সুরক্ষা নীতিমালার অনুশীলন করছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ ও নারী এবং শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, যৌন হয়রানি ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন নীতিমালার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে (Core Humanitarian Standard- CHS); মানবতা, নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতশুণ্য এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করে কর্মসূচি অংশগ্রহণকারীদের মানবাধিকার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। এসকেএস মনে করে মানবাধিকার সর্বক্ষেত্রে এবং সবার জন্য প্রযোজ্য।

লেখকঃ উন্নয়ন কর্মী।

মানবাধিকার ও প্রতিবন্ধিতা

মোঃ সাইফুল ইসলাম রিংকু

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য 'স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন সেবা প্রাপ্তির অধিকার'কে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির এ অধিকার লঙ্ঘিত হলে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট অধিকার বিষয়ে বলা হয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিপূরক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে আলাদাভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সনদ প্রণীত হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ প্রতিবন্ধী মানুষ। শুধু সমাজ বা রাষ্ট্র থেকেই নয়; পরিবার থেকেও প্রায়শই বঞ্চনা আর নেতিবাচক আচরণের শিকার হন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর দেশে দেশে প্রতিবন্ধীদের রয়েছে নানা বঞ্চনা আর বৈষম্যের অভিজ্ঞতা। বঞ্চনা আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে নিজের অধিকার আদায়ে প্রতিবন্ধীরা নানাভাবে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। দুনিয়াব্যাপী প্রতিবন্ধিতা আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্জন জাতিসংঘ প্রতিবন্ধীর অধিকার সনদ বা সিআরপিডি।

অন্যান্য স্বাভাবিক মানুষের ন্যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও রয়েছে সমাজের সকল স্তরে সমান অংশগ্রহণ, বিভিন্ন সেবা, শিক্ষা, চিকিৎসা, মতপ্রকাশ, মর্যাদা ও সুরক্ষা এবং সামাজিক জীবনের সম-সুযোগ লাভের অধিকার। অনেকের মতো আমাদেরও ভাবনা মানবাধিকার থাকার পরও কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য আলাদা আইন বা নীতিমালার প্রয়োজন হবে। সরকারের আইন ও নীতিমালা থাকার পরও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাদের পূর্ণ অধিকার ও সুরক্ষা হতে বঞ্চিত। একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী মো. সালেহীন মোস্তাক বয়স ২০, বাড়ি সিরাজগঞ্জ সদর। শারীরিক সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও তিনি ২০২৪ বিজ্ঞান গ্রুপ হতে এসএসসি পাশ করেন। উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের প্রত্যাশায় এইচএসসিতে ভর্তির লক্ষ্যে তিনি সিরাজগঞ্জ ইসলামীয়া কলেজে ভর্তির আশা নিয়ে অনলাইনে আবেদন করেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস স্বাভাবিক ছাত্রদের নিয়মের চক্রে পড়ে তিনি ভর্তির জন্য ডাক পান রাজশাহী বানেশ্বর। এখন কথা হলো, তিনি তো অন্য স্বাভাবিক ছাত্রদের মতো নয় যে, যেকোন প্রকিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবেন। ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ছাত্রদের নিজ জেলায় ভর্তির সুযোগ না রাখা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি সরকারের একধরনের বৈষম্য, যা তাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে বাধা।

এমন অনেক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত করে। প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১২টি শ্রেনিতে শনাক্তকরণ করা হয়। যেমন- অটিজম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, ডাউন সিনড্রোম, সেরিব্রাল পালসি, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, বাক্প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা ৩৫ লাখ ৫০ হাজার ৬৭৬জন। বর্তমানে সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্তু হ্রাস পাচ্ছে তাদের প্রতি যত্ন, মর্যাদা, সম্মান। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই তার পরিবার এবং সমাজ কর্তৃক অবহেলার শিকার হন; যা তাদের নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবন-যাপনের জন্য হুমকি। এমতাবস্থায় পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাদের অধিকার, মর্যাদা ও সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদেরকে সচেতন করা যেমন জরুরি, তেমনি প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি কমানোর জন্যও প্রয়োজন সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। যেমন দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রয়োজন ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা। গর্ভকালীন প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রয়োজন কিশোরী ও অভিভাবকদের সচেতন করা। অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রয়োজন চলমান স্বাস্থ্যসেবার সাথে ফিজিওথেরাপি স্বাস্থ্যসেবা কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে নিশ্চিত করা।

আমরা আমাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ করেছি যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সীমাবদ্ধতা এবং সক্ষমতা বিবেচনা করে তাদের বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলা সম্ভব। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অনেক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করলেও, যথাযথ বাস্তবায়ন না থাকার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ এর সুফল হতে বঞ্চিত।

আমরা আমাদের সমাজে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো লক্ষ্য করছি; যেমন- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়গুলোতে কোনো ঢালু পথ না থাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি সেবায় প্রবেশগম্যতার সুযোগ কম। আপনারা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার যে সব কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করেছ, সেখানেও কোনো ঢালু পথ না থাকার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বৈষম্যের স্বীকার হন। এছাড়াও সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো- যেমন মসজিদগুলোতে ঢালু পথের কোনো ব্যবস্থা না থাকার কারণে ইচ্ছা থাকার পরও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ মসজিদে গিয়ে ইবাদত করতে পারে না; যা তাদেরকে ধর্মীয় ও সামাজিক যোগযোগ হতে বিচ্ছিন্ন রাখে। আসুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করি; যা তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

লেখকঃ নির্বাহী পরিচালক, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থা, লক্ষ্মীপুর।

গাইবান্ধার আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি

প্রবীর চক্রবর্তী

গাইবান্ধা জেলা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় অঞ্চল। গাইবান্ধা সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে পরিচিত। এখানে সাঁওতাল, ওরাঁও, পাহান, মাহালি, মুণ্ডা, কোলসহ বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষিকাজ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক কাঠামো গাইবান্ধার সামগ্রিক সমাজ ও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু সমতলের অন্যান্য জেলার মতো গাইবান্ধাতেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি আজ গভীর সংকটের মুখে। ভূমি হারানো, সামাজিক বৈষম্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবায় বঞ্চনা, সহিংসতা, শ্রমশোষণ এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় সংকট- এসব চ্যালেঞ্জ তাদের জীবনধারাকে নানাভাবে বিপন্ন করে তুলেছে।

গাইবান্ধায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় সমস্যা ভূমি অধিকার। ঐতিহাসিকভাবে জমিই ছিল তাদের পরিচয়, জীবন ও জীবিকার মূল ভিত্তি। কিন্তু জমির মালিকানা দলিল না থাকা, প্রভাবশালী গোষ্ঠী কর্তৃক জমির দখল, মামলা-মোকদ্দমা এবং দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা- এসব কারণে বহু পরিবার বছরের পর বছর ধরে ভূমি হারিয়ে দারিদ্র্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। সাঁওতালদের জমি দখলের ঘটনা, ক্ষেত-খামারে প্রবেশে বাধা, ফসল লুট বা আগুন লাগানোর মতো সহিংসতা প্রায়ই স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে উঠে আসে। জমি রক্ষার জন্য প্রতিবাদ, মানববন্ধন বা অভিযোগ করলেও বিচার না হওয়া এবং প্রভাবশালী মহলের চাপের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ন্যায্য অধিকার পায় না।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার এখনো সীমিত। অনেক পরিবার দারিদ্র্য, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভাষাগত বাধা এবং সামাজিক বৈষম্যের কারণে শিশুদের নিয়মিত স্কুলে পাঠাতে পারে না। শিশুরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে ইটভাটা, কৃষিখামার বা দিনমজুরির কাজে নিয়োজিত হয়। আদিবাসী ভাষাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা না থাকায় ছোট শিশুদের শুরুর শিক্ষাজীবনেই অসুবিধা তৈরি হয়। স্বাস্থ্যসেবায়ও একই চিত্র। কমিউনিটি ক্লিনিক বা হাসপাতালে গেলে অনেক সময় বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ পাওয়া যায়। মাতৃস্বাস্থ্য, পুষ্টি, টিকাদান এবং শিশুর স্বাস্থ্যসেবা- এসব খাতে তাদের অংশগ্রহণ অপ্রতুল থাকার কারণে পুরো সম্প্রদায় স্বাস্থ্যঝুঁকিতে।

অর্থনৈতিক শোষণও গাইবান্ধার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বড় একটি সমস্যা। জমি হারানোর পর অনেকে দিনমজুরির কাজে যুক্ত হলেও তাদের মজুরি সমান নয়। অনেক সময় মৌসুমে কাজের সংকটে অভুক্ত থাকার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ইটভাটায় আদিবাসী নারী-পুরুষ ও শিশুদের শ্রমশোষণ, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করানো এবং মজুরি বঞ্চনার ঘটনা নিয়মিত শোনা যায়। নারীরা দ্বিগুণ বৈষম্যের শিকার। একদিকে আদিবাসী পরিচয়ের কারণে বঞ্চনা, অন্যদিকে নারী হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও হয়রানি। যৌন হয়রানি, গৃহস্থালিকাজে শোষণ, জোরপূর্বক শ্রমের মতো সমস্যাগুলো তাদের জীবনে স্থায়ী অস্থিরতা তৈরি করে।

সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণও গাইবান্ধার মানবাধিকার পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আদিবাসী সম্প্রদায়ের উৎসব, নৃত্য, সংগীত, বিশ্বাস-অনুষ্ঠান, ভাষা এখন নানা চাপে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত সহযোগিতা বা সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার উদ্যোগ না থাকায় অনেক ঐতিহ্য বিলুপ্তির পথে। গণমাধ্যমে তাদের উপস্থিতি সীমিত, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের অংশগ্রহণ খুব কম। এ কারণে নীতি-নির্ধারণে তাদের চাহিদা ও সমস্যাগুলো প্রতিফলিত হয় না।

সংগঠন ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অনেক এলাকা রাজনৈতিক প্রভাবাধীন হওয়ায় আদিবাসী নেতারা নির্ভয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারে না। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নথিবদ্ধ করা, মামলা করা বা আইনগত সহায়তা নেওয়াও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে বিচারহীনতার একটি দুষ্টচক্র সৃষ্টি হয়; যা আরও বেশি লঙ্ঘনের সুযোগ বাড়িয়ে দেয়।

অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব যদি জেলা প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা, আদিবাসী ভাষাভিত্তিক শিক্ষা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্য রোধ, সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ, শ্রমবাজারে ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিটি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত। স্থানীয় সরকার, মানবাধিকার সংগঠন, গণমাধ্যম ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করলে পরিস্থিতির বাস্তব উন্নতি সম্ভব।

সবশেষে বলা যায়, গাইবান্ধার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার কেবল একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়; এটি ন্যায়, সমতা, এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্ন। তাদের অধিকার সুরক্ষিত হলেই এই অঞ্চলের অর্থনীতি, সামাজিক সম্প্রীতি ও মানব উন্নয়ন আরও শক্তিশালী ভিত্তি পাবে।

লেখকঃ নির্বাহী পরিচালক, অবলম্বন।

মানবাধিকারের ধারণা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মোদাচ্ছেরুজ্জামান মিলু

মানবাধিকার বিষয়ে ধারণা আমাদের অনেকের আছে আবার অনেকের তেমন নাই। মানবাধিকার বিষয়ে কথা উঠলে কিছু শব্দ উঠে আসে যেমনঃ অধিকার, মৌলিক চাহিদা, মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার। সবগুলি কথার মধ্যে অধিকার বোধটি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। মানবাধিকার কি এবং কাজ কি, একজন মানুষের অধিকার রক্ষায় দেশের আইনে, নাগরিকের মৌলিক অধিকার কিভাবে সম্পর্কিত, মানবাধিকারের সাথে সে সব বিষয়ে নাগরিকের ধারণা থাকা জরুরি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্বের অনেক দেশে জান-মালের ক্ষতি হয়; অনেক নারী, শিশু ও সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়। বিবেকের তাড়নায় ঠিক তখনই পৃথিবীর কিছু দেশ ও দেশের সচেতন মানুষ আন্তর্জাতিকভাবে একটি সংঘ গড়ে তোলার চিন্তা-ভাবনা করলো। এ সব চিন্তার পরবর্তী অর্জন হচ্ছে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা। আমরা ইরেজিতে শুনেছি টহরঃবফ ঘধঃরড়হং (টঘ)। এভাবে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। তখন থেকে বিশ্বের প্রতিটি দেশে ১০ ডিসেম্বর দিনটিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। একজন মানুষ কিছু অধিকার নিয়েই জন্মগ্রহণ করে; যা জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই অধিকার বলতে মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের কাছে ন্যায্যতার ভিত্তিতে যা পাওয়ার কথা, সেটিই হচ্ছে অধিকার। তাই বলা যায়, অধিকার হচ্ছে আবশ্যিকভাবে প্রাপ্য, কোনো অবস্থাতেই করুণা নয়। আমাদের দেশের সরকার মানবাধিকারের ৩০টি ধারা থেকে বেশ কিছু ধারা বাংলাদেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত করেছে, যেগুলিকে আমরা মৌলিক অধিকার হিসেবে জানি। এভাবে পৃথিবীর অনেক দেশ মানবাধিকারের অনেক ধারা তাদের নিজেদের সংবিধানের সাথে সংযুক্ত করেছে।

বাংলাদেশের কিছু অধিকার কর্মী বলে থাকেন যে, সব মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার, কিন্তু সব মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়। সংবিধানের কোনগুলি মৌলিক অধিকার? যেমনঃ মত প্রকাশের অধিকার, ধর্মপালনের অধিকার, সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার, স্বাধীন পেশা গ্রহণের অধিকার, বিবাহ করার অধিকার, ভোট প্রদানের অধিকার ইত্যাদিসহ মোট ১৮টি মৌলিক অধিকার আছে। মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে একজন ব্যক্তি আইনের আশ্রয় নিতে পারবে; কেননা এই অধিকারগুলি সাংবিধানিক আইন দ্বারা স্বীকৃত। এদিকে আমরা ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছি যে, ৫টি মৌলিক চাহিদা রয়েছে যেমনঃ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা। যদিও মৌলিক চাহিদাগুলির সাথে আরো ২টি সংযুক্ত হয়ে ৭টি হয়েছে বলে জানা যায়। এখন কথা হচ্ছে, অন্ন একটি মৌলিক চাহিদা। যদি টাকার অভাবে কেউ না খেয়ে থাকে তবে সরকারের ওপর চাপ তৈরী হবে বটে; কিন্তু সেই ব্যক্তি আইনের মাধ্যমে কোনো প্রতিকার চাইতে পারবে না। পক্ষান্তরে যার সম্পত্তি তার ভোগ করার অধিকার আছে, যা একটি মৌলিক অধিকার। কেউ যদি অন্যের সম্পত্তি দখল করে নেয়, তবে ভুক্তভোগী ব্যক্তি আইনের আশ্রয় নিতে পারবে। অনেক শিক্ষিত মানুষ

ভুল করে মৌলিক চাহিদাগুলিকে বলেন মৌলিক অধিকার। আমাদের দেশে নারী অধিকার, শিশু অধিকারসহ প্রতিবন্ধীদের অধিকার লঙ্ঘিত হলেও মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে।

মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য আমাদের দেশে একটি মানবাধিকার কমিশন রয়েছে যার পূর্ণ নাম 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন'। বাংলাদশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ এর অধীনে গঠিত একটি স্বাধীন ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। ২০১২ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকারের ধারণা, উপলব্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে বাংলাদেশের মানবাধিকার সম্পর্কে একটি ভিত্তি জরিপ করা হয়। এ জরিপের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সংখ্যাগত জরিপের অর্ধেক উত্তরদাতা হিসেবে ৫২.২% মানবাধিকারের ধারণার কথা শোনেনি। এদিকে মানবাধিকার সম্পর্কে যাদের কিছুটা ধারণা আছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই মনে করে যে, মানবাধিকার হচ্ছে মানুষের অধিকার সম্পর্কিত। আবার মানবাধিকার কথাটি শুনেছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে ১৮.১% জানে না, যে মানবাধিকার শব্দটি কি অর্থ বহন করে। এভাবে এই জরিপের আরো অনেক উপাত্ত আছে সেখানেও একই ধরনের চিত্র দেখা যায়।

কোন কোন বিষয়গুলি অপরাধ এবং কোন কোন বিষয়গুলি মানবাধিকার লঙ্ঘন, সে বিষয়েও আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। সোজা-সাপ্টা কথায় বলা যায়, কেউ কোনো অপরাধ করলে তার প্রতিকার চেয়ে যদি কেউ প্রতিকার পায় তবে সেটি মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়। অপরদিকে সহজভাবে বলা যায়, যদি কোনো সংঘটিত অপরাধের সাথে সরকারের অবহেলা পরিলক্ষিত হয় বা সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্টতা থাকে, সেক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলা যায়। তাই অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন এক নয়।

বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন'নামের প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে অনেকেই জানেন না। অনেকে মানবাধিকার নামটি ব্যবহার করে এনজিও ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠন করে কিছু আইডি কার্ড বানিয়ে কেনা-বেচা করতে দেখা গেছে মফস্বল জেলাগুলিতে। কেউ কেউ এই কার্ড দেখিয়ে নিজেকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার সদস্য দাবী করে। সমস্যা হচ্ছে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকদেরও এ বিষয়ে কম ধারণা থাকায় সেই ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা হচ্ছে না। মনে রাখতে হবে যে, মানবাধিকার কোনো সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়; কোনো কালের আবর্তে বাঁধা নয় এবং হস্তান্তর যোগ্য নয়। মানবাধিকার সর্বজনীন। মানবাধিকারের পাঁচটি ভিত্তি হলো মর্যাদা, স্বাধীনতা, সমতা, অবিভাজ্যতা ও সর্বজনীনতা। তাই দেখা যায়, নারী অধিকার লঙ্ঘন, শিশু অধিকার লঙ্ঘন, ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে বাধা, বিচার প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা, বিনা বিচারে আটক, জোরপূর্বক আটক, হত্যা, খুন, গুম ইত্যাদি সবই মানবাধিকার লঙ্ঘন। মানবাধিকার লঙ্ঘন কমাতে হলে সকলকে মানবাধিকার সম্পর্কে জানতে হবে।

লেখকঃ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, দৈনিক মাধুকর।

সম্পাদক: কে এম রেজাউল হক, প্রকাশক: রাসেল আহম্মেদ লিটন কর্তৃক এসকেএস প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত এবং সার্কুলার রোড গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত।
সার্কুলেশন: ০১৭০১৭৬৪৮৩০, e-mail: dailymadhukar@gmail.com